মুসলিমপূর্ব বাংলার ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতা

(Religion, Society, Culture and Morality in Pre-Muslim Bangla)

আবু নোমান মো. আসাদুল্লাহ[১]

Abstract: 'Bango' was one of many ancient names of Bangla. Before the arrival of Muslim, Bengal was mainly the residence of Hindus and Buddhists. Throughout this period, the internal conflict, disputes and unexpected nature of different religions used to insult humanity very often. As a result, the society had been filthy and contaminated. People of lower class tried to live with honor, but their humanity was undermined and harassed by the people of the so-called upper class against their hopes and aspirations. The communication between Arab, the birthplace of Islam, and Bangla was in existence from the ancient period. At first, the reason of this communication was mainly business. Subsequently, Muslim preachers with the Arab businessmen came in Bangla and started religious preaching. In 1204, Ikhtyar Uddin Muhammad Bakhtyar Khaljee first introduced Muslim rule after conquering Bangla.

Keywords: Religion in Pre-Muslim Bangla, Society & Culture in Pre-Muslim Bangla, and Morality in Pre-Muslim Bangla

আবহমানকাল থেকে বাংলা অঞ্চলটি বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও গোত্রের মিলনমেলা হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ভূগোল, ভাষা ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে জনগোষ্ঠীকে বাঙালি এবং যে ভু-খণ্ডকে আমরা বাংলাদেশ হিসেবে নির্ণয় করে থাকি, তা আধুনিক কালের ধারণায় (শরীফ, ১৯৭৮, পৃ. ১)। প্রাচীনকালে এদেশের নাম বাংলা যেমন ছিলো না তেমনি এতদঞ্চল ছিলো বিভিন্ন অঞ্চল বা জনপদে বিভক্ত। পরিবর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে বাংলার আকার, আয়তন ও অবস্থানের প্রায়শই পরিবর্তন ঘটেছে (শাহনাওয়াজ ও সালেহ, ২০০৭, পৃ. ৭২৯)। মুসলিম বিজয়ের পূর্বেও এ অঞ্চলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শাসকের অধীনে ছিলো (মজুমদার, ১৯৯২, পৃ. ১-২)। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে (Gupta, 1975-76, pp. 33-34; করিম, ১৯৯৯, পৃ. ৯৩; করিম, ২০০৮, পৃ. ২০)। এ সময় বাংলার অবস্থান ছিলো- উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে তেলিয়াগতি গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল জনপদ (Ali, 1985, p. 420)। স্থানটি গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী এবং মুসলিম বিজয়ের পরে লাখনৌতি হিসেবে পরিচিত হয় (সিরাজ, ১৯৮৩, পৃ. ২৮)। মুসলমান আগমনের পূর্বে বাংলা অঞ্চলে প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বসবাস ছিলো। এ সময়ে ধর্মগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহ ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে মানবিকতা প্রায়শই অসম্মানিত হয়েছে। সর্বস্তরে অনৈতিকতার অনুপ্রবেশে সমাজ কলুষিত হয়েছে। এসময় সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের একটু সম্মানজনকভাবে বাঁচার প্রয়াস উপেক্ষিত হয়েছে। উচ্চবিত্ত শ্রেণি নিম্নবর্ণের মানুষের আকাঙ্ক্ষার

[1] Assistant Professor, Department of Islamic History and Culture, Rajshahi College, Rajshahi. Email: noman_asadullah@yahoo.com

বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মানবতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে (মজুমদার, ১৯৯৫, পৃ.৭৪) । এই প্রবন্ধে মুসলিম বিজয়-পূর্ব বাংলার ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার গতিপ্রকৃতির একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাওয়া গেছে।

মুসলিম বিজয়পূর্বকালে বাংলায় প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মানুষের বসবাস ছিলো। তখন কেবল মুসলমানদের আগমনের ধারার সূচনা হয়েছে (জলিল, ১৯৯৬, পৃ. ২৮)। সংখ্যাল্পতা ও সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে সমাজে বৌদ্ধ সম্প্রদায় কার্যত গুরুতহীন ছিলো। নিজেদের অভ্যন্তরীণ দুরাচার এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির দাপটের বিপরীতে ইসলামের উদারনৈতিক আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে সমাজে বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিলো (বন্দোপাধ্যায়, ১৯৮০, পৃ. ৫৪-৬০; করিম, ১৯৯১,পৃ. ২৪৫)। বাংলায় হিন্দু সমাজ নানা শ্রেণি ও উপশ্রেণিতে বিভক্ত ছিলো। হিন্দু সমাজের বর্ণবাদের ঐতিহ্যও সুদীর্ঘকালের এবং বর্ণবিন্যাসের ভিত্তিতেই ভারতীয় সমাজ বিন্যস্ত হয়েছে (রায়, ১৪০২, পৃ. ১৩২)। এ সময়ে বাংলায় প্রধানত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের হিন্দু দেখা যেত। এর বাইরে আরো অসংখ্য বর্ণ ও কৌম বিদ্যমান ছিলো। এ ছাড়াও প্রত্যেক বর্ণ ও কৌমের ভেতর স্তর ও উপস্তর ছিলো (রায়, ১৪০২, পৃ. ১৩২)। হিন্দুধর্ম মূলত আর্য ধর্মের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত (জলিল, ১৯৯৬, পৃ. ৩০)। আর্যরা ছিলো বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী। একত্ববাদী অনার্য তথা দ্রাবিড়দের পরেই বাংলায় আর্যদের আগমন শুরু হয়। বাংলায় দ্রাবিড়রা প্রথম ধর্ম পালন করতো বলে ধারণা পাওয়া যায়। তাদের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে যেটুকু জানা যায়, তাতে অনুমান করা সমীচীন যে, তারা ছিলো ননবৈদিক ধর্মের অনুসারী। তাদের ধর্মমত ছিলো একত্ববাদের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীতে বাংলায় আগমনকারী আর্যরা ছিলো বহুত্ববাদের অনুসারী। এ কারণে অবৈদিক দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদের বিরোধ চলতে থাকে। আর এ বিরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিলো (তালিব, ১৯৮০, পৃ. ৩৫)। তার প্রমাণ হিন্দুদের পুরাণাদি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকেও পাওয়া যায় (পণ্ডিত, ১৩১৪, পৃ. ১৪০-১৪২)।

আর্যরা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, পবন প্রভৃতির পূজা করতো। এভাবে তাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠিত হয় বলে অনুমিত হয়। ধর্মকার্য অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দানের ফলে সমাজে তারা বেশ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। ফলে ধীরে ধীরে তারা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ, অবতার, অতিমানব ও মানবশ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রচার করতে থাকে। এভাবেই আর্য ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পরিণত হয়। আর্যধর্মে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য স্বীকৃত হবার পর সমাজ জীবনেও তার প্রভাব পড়ে। তাঁরা সমাজের উচ্চ শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়। এমনকি অস্ত্র পরিচালনা ও শাসনকার্য পরিচালনারত ক্ষত্রিয়রাও ব্রাহ্মণদের নিচের শ্রেণির নাগরিক হিসেবে সমাজে স্বীকৃত হয়। তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বৈশ্যরা স্থান লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কারবার ছিলো তাঁদের কাজ। সমাজের সর্বনিম্ন পর্যায়ের নাগরিক হিসেবে স্থান পায় শূদ্ররা। এভাবে আর্যরা নিজেদের অবস্থানকে উর্ধ্বে রেখে সমাজের বিস্তৃত অগণিত সাধারণ নাগরিকদের চতুর্থ শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও বঞ্চনার মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে থাকে। ফলে সমাজজীবনে এক অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয় (তালিব, ১৯৮০, পৃ. ৩৫)।

চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর (৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ) বিবরণ থেকে জানা যায় বাংলার জৈন ধর্মাবলম্বীদের[২] সংখ্যা অনেক বেশি ছিলো। জৈনরা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদকে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার এবং

[২] খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দে জৈন ধর্মের প্রচারক বর্ধমান মহাবীর এক বঞ্চিত ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আঠাশ বৎসর পর্যন্ত তিনি গৃহে অবস্থান করে সংসারধর্ম পালন করেন। আঠাশ বৎসর পর তিনি গৃহত্যাগ করে একাদিক্রমে

হিন্দুদের রীতিনীতিকে অর্থহীন মনে করলে তারা হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিহিংসার শিকারে পরিণত হয় (রায়, ১৪০২, পৃ. ৫০১-৫০২)।

ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল আধিপত্যের প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৭ অব্দে হিমালয়ের কপিলাবস্তু নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি সংসারধর্মে রত ছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ করে সংসারধর্ম ত্যাগ করেন এবং দীর্ঘ ছয় বছর সাধনার পর সিদ্ধি লাভ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৭ অব্দে তিনি কুশী নগরে দেহত্যাগ করেন। বৌদ্ধ দেবের শিক্ষা ছিলো, অহিংসা, দয়া, দান, সৎচিন্তা, সংযম, সত্যভাষণ, সৎকার্য সাধন, স্রষ্টাতে আত্মসমর্পণ ইত্যাদি (তালিব, ১৯৮০, পৃ. ৩৬-৩৭)। গুপ্ত যুগ ও গুপ্তোত্তর বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থান বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ অনার্য ও দ্রাবিড়রা বৌদ্ধমত গ্রহণ করে নিজেদের সম্মান ও মানবাধিকার রক্ষার চেষ্টা করে। সপ্তম শতকের দিকে খড়্গ বংশীয় রাজারা, অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পাল রাজারা, দশম শতকে কান্তিদেব, দশম-একাদশ শতকে চন্দ্র বংশীয় রাজারা এবং দশম শতকের কম্বোজাম্বর রাজারা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন (ইসলাম, ১৪০২, পৃ. ৩৩-৩৯) । তারাও ব্রাহ্মণ্যবাদের রোষাণলে পতিত হন (তালিব, ১৯৮০, পৃ. ৩৭)। ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শীদের প্রভাবেই বৌদ্ধধর্ম মহাযান ও হীনযান অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভক্ত অংশগুলোও হিন্দুদের প্রভাবে অনেক অংশে বিভক্ত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের বিভক্ত মহাযান মতবাদ থেকে বজ্রযান, মন্ত্রযান ও কালচক্রযান ইত্যাদি অংশে বিভক্ত হয়ে নতুন আঙ্গিক ধারণ করে। কালচক্রযানীরা তিথি, নক্ষত্র ও রাশিকে প্রাধান্য দেয়। তাদের মতে কালচক্রই বুদ্ধের জন্মদাতা। যোগসাধনার মাধ্যমে প্রাণ-প্রক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করতে পারলেই কালচক্র নিরস্ত হয়; ফলে মোক্ষ লাভ হয় (ইসলাম, ১৪০২, পৃ. ২৮)।

সেন বংশের মধ্যে লক্ষণ সেন ও তার বংশধরগণ বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মানুসারীদের মধ্যে যারা সংসার ধর্ম পালন করে না তাদের শ্রীকৃষ্ণ এবং যারা সংসারধর্ম পালন করে তাদের গৃহী বৈষ্ণব বলা হতো (আজরফ, ১৯৯৫, পৃ. ৬)। পাল ও চন্দ্র যুগে শৈব ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সৌর ধর্মের বিকাশ ঘটেছিলো বাংলায়। পাল ও চন্দ্র যুগে সৌর পূজার বিশেষ প্রসার ঘটে (ইসলাম, ১৪০২, পৃ. ২৫-২৭)। রাজশাহী জেলার মান্দায় ত্রিশিব সূর্য মূর্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো (ইসলাম, ১৪০২, পৃ. ৩১)।

বাংলা বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের লালনক্ষেত্র হিসেবে অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। বাংলার মানুষ আর্য ধর্ম থেকে শুরু করে জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, শৈব ও সৌর ধর্মসহ বিভিন্ন বর্ণের আশ্রয়ে বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সুলতানি যুগে বাংলা ছিলো বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের লীলাভূমি। এসময়ের বাংলার ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত পরবর্তী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমসাময়িক কবি ও লেখকদের অনেকে এই সময়ের ধর্মীয় পরিবেশ ও সমাজকে অত্যন্ত বিপর্যয়কর গণ্য করেছেন। আবার অনেকে এই সময়ের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এবং সমকালীন সমাজ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একই

চৌদ্দ বছর তপস্যা করে সিদ্ধ লাভ করে ধর্ম প্রচার করেন। তিনি ৫২৭ খ্রিস্টাব্দে বিহারের বাওয়াপুরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মহাবীর (খিস্টর্পূব আনুমানিক ৫৯৯–৫২৭) জৈনদের সকল ধর্মীয় গ্রন্থের উৎস গণ্য হয়ে থাকেন । তিনি সমাজের অস্থিতিশীল, বিশৃংখলাপূর্ণ এবং মানবতার দুদর্শাগ্রস্ত অবস্থা অবলোকন করে শান্তির প্রত্যাশায় গৃহত্যাগ করে বনে জঙ্গলে কৃচ্ছ্রতা সাধনে ব্রতী হন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর বাংলার রাঢ় প্রদেশে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন (তালিব, ১৯৮০, পৃ. ৩৫-৩৬; রায়, ১৪০২, পৃ. ৫০১; ইসলাম, ১৪০২, পৃ. ২৩)।

সমাজে পাশাপাশি বসবাসরত প্রধান দুইটি ধর্মসম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক ও সমঝোতার একটি সূত্র তৈরি করেছিলো (শাহনাওয়াজ, ১৯৯৯, পৃ. ১৫)।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় বসবাস করতো মূলত হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্ত্যজ শ্রেণির অধিবাসী ও কিছু সংখ্যক জৈন। পাল বংশের পতনের পর থেকে বৌদ্ধদের রাজনৈতিক প্রাধান্য কমতে থাকে। গৌড়ের সিংহাসনে হিন্দু সেন রাজবংশের আরোহণের ফলে বৌদ্ধ, জৈনসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ৩০)। লক্ষণ সেন বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছায় অন্যান্য ধর্মের মানুষকে উৎপীড়ন করেন। অবশ্য, রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার বখতিয়ার খলজীকে একজন লুটেরা আখ্যায়িত করেন। তাদের মতে, বখতিয়ার খলজীর আক্রমণে লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে বাংলায় বিরাজিত সুখ ও শান্তি বিনষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু লক্ষণ সেনের সময়েই ব্রাহ্মণদের রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে সাধারণ মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে উদ্ধারকৃত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন *চর্যাপদ* থেকে বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। চর্যাপদের কবি ঢেন্ঢন পাদ এর ভাষায়:

'জো সো বুধী সোই নিবুধী
জো সো চৌর সোই সাধী'
অর্থ: 'যে বুঝে সে নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু।'

আর একটি চর্যার কবি ভুসুকুপাদ উল্লেখ করেছেন, ''কাহেরে খিনি মেলি আচ্ছুহু কীস
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস।।
অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড় অ ভুসুকু অহেরী।।
তিন ন চুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণির নিল অ ণ জানী।।
হরিণী বোল অ হরিণা সুন হরিআ তো।
এ বন চাড়ী হোহু ভান্তো।।
তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীস অ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ন পইসঈ।।"

পদগুলোর অর্থ দাঁড়ায়: ''কাকে নিয়ে ছেড়ে কেমন করে আছো, আমাকে ঘিরে চারদিকে হাক পড়ে। আপন মাংসের জন্যই হরিণ শত্রু। এক মুহূর্তের জন্যও শিকারী ভুসুকু ছাড়ে না। হরিণ ঘাসও ছোয়না, পানিও পান করে না। হরিণ-হরিণীর নিলয় জানা যায় না। হরিণী বলে হরিণ তুমি শোন, এ বন ছেড়ে দূরে চলে যাও (মজুমদার, ১৯৯৫, পৃ. ১০২-১০৩)। ত্রয়োদশ শতকের কবি রামাই পণ্ডিত তার *শূণ্যপূরাণে* শ্রী নিরঞ্জন রুষ্মায় কবিতার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের নির্যাতন-নিপীড়নের করুণ চিত্র এঁকেছেন :

''জাজপুর পুরবাদি সোলসঅ ঘর বেদি
বেদি লয় কন্নয় যুন ।
দখিনা, মাগিতে জাঅ, জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়া পুড়ায় ভুবন।।
মালদহে মাগে কর, না চিনে আপন পর
জালের নাঞিক দিসপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড় দস বিস হয়্যা জড়,

সদ্ধর্মিরে করএ বিনাস।।
বেদ করে উচ্চারণ বের‍্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিআ সবায় কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম,
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান।।
এই রূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ,
ই বড় হোইল অবিচার
বৈকণ্ঠে খাকিআ ধম্ম মনেতে পাইয়া মম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার।।"

আধুনিক বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায়: জাজপুরে ষোল শত বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস। তারা কানে পৈতা তুলে দক্ষিণা চাইতে যায়। যার ঘরে দক্ষিণা পায় না অভিশাপ দিয়ে তার সংসার পুড়িয়ে দেয়। মালদহে তারা আপন পর না ভেবে কর বসিয়ে দেয়। তাদের জাল জুয়াচুরির শেষ নেই। তারা বড় শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। দল বেঁধে সধর্মীকে (বৌদ্ধ জনসাধারণকে) বিনাশ করছে। তারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে, তাদের মুখ থেকে ঘন ঘন অগ্নি বের হয়, সকলে তা দেখে ভয়ে কম্পমান। সকলে মনে মনে বলে, ধর্মদেবতা, রক্ষা করো, তুমি ছাড়া কে আমাদের উদ্ধার করবে? (সেন, ১৯৯১, পৃ. ৫৫-৫৬; ওদুদ, ১৯৯০, পৃ. ৮৬)।

সামাজিকভাবে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের তেমন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তারা শূদ্র সমাজের মধ্যে গণ্য হতো। *বৃহদ্ধর্ম পুরাণে* শূদ্র জাতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) উত্তম সংকর যথাকরণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, নাপিত, গোপ, কর্মকার, তৈলিক, কুম্ভকার, শঙ্খকার, দাসচাষী, বারুজীবী, মোদক, মালাকার, সূত, রাজপুত্র ও তাম্বুলী (২) মধ্যম সঙ্কর যথা– তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈল কারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক (৩) অধম সঙ্কর যথা – মলেগ্রহি, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, খট্টজীবী, ডোলবাহী ও মল্ল। প্রথমে তাদের সংখ্যা ৩৬ থাকলেও পরবর্তীতে এদেরকে ৫ জাতিতে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে (ইসলাম, ১৪০২, পৃ. ৪০-৪২)। শূদ্রদের স্তরের চেয়ে নিম্নে ছিলো অন্ত্যজ শ্রেণি। এই উভয় শ্রেণি সমাজে অবহেলিত ছিলো। ব্রাহ্মণরা এই নিচুশ্রেণি থেকে সব সময় দূরে থাকতো। হিন্দু সমাজের উঁচুশ্রেণির মধ্যে পতিতাবৃত্তি প্রচলিত ছিলো। পতিতাবৃত্তি সমাজে কোন নিন্দনীয় কাজ বিবেচিত হতো না। এ সম্পর্কে চর্যাপদে উল্লেখ পাওয়া যায়।

নগর বাহিরেঁ রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাইসি বামহন নাড়িআ ।

অর্থাৎ ডোম্বীনীর সঙ্গে মিলিত হবার বাসনায় ব্রাহ্মণরা তাদের ঘরের আশেপাশে সময়ে অসময়ে কামতাড়িত হয়ে বেড়াতো। চর্যাপদের অন্য একটি শ্লোকে এ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়:

দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামারু জাঅ ।।

অর্থাৎ দিনে বউটি কাকের ভয় পায় কিন্তু রাত্রে অভিসার যাত্রায় যত দূরেই হোক না কেন সে পিছপা হয় না (মজুমদার, ১৯৯৫, পৃ. ৩৫-৪১)। সেন যুগে (১০৯৭-১২২৫ খ্রিস্টাব্দ) নর-নারীরা বিলাসিতার মাঝে জীবন

অতিবাহিত করতো। ধোয়ীর *পবনদূত* ও গোবর্দ্ধন আচার্য্যের *আর্য্যা সপ্তশতী* থেকে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের অভিরুচি এবং ব্রাহ্মণগণের যৌনতার কুরুচিপূর্ণ চিত্র সহজই অনুমান করা যায়:

বৃদ্ধোক্ষাণস্তন পরিসরাঃ কুঙ্কুম স্যাঙ্গঁরাগা
দোলাঃ কেলি ব্যসনরসিকা ঃ সুন্দরীণাং সমূহাঃ
ক্রীড়াবাপ্য ঃ প্রতনু - সলিলা মালতীদাম রাত্রিঃ
স্ত্যানজ্যোৎস্নামুদমবিরতং কুর্ব্বতে যত্র যূনাং।।
ভ্রাম্যন্তীনাং ভ্রমসি নিবিড়ে বল্লভাকাঙ্খিনীনাং
লাক্ষারাগাশ্চরণগলিতাঃ পৌরসীমন্তিনীনাম।
রক্তাশোকস্তবকললি তৈর্বালভানোর্ময়ুখে
নালক্ষ্যন্তে রজনিবিগমে পৌরমার্গে ষু যত্র।

অর্থাৎ "এই সময় দেশের মধ্যে ব্যভিচার এতই বেড়ে গিয়েছিলো যে, সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণীগণও রাতে চাঁদের আলোয় রাজপথে নগরবাসীদের সাথে প্রেমালাপে সম্পূর্ণ রাত কাটিয়ে দিতো (মণ্ডল, n.d., পৃ. ৬৭-৬৮)। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষেরা মদ পান করতো। বিভিন্ন ধরনের মদের প্রচলন ছিলো। দোকানে প্রকাশ্যে মদ ক্রয়-বিক্রয় হতো। মদের সর্বগ্রাসী প্রভাব সমাজকে স্থবির করে রেখেছিলো। *সুদক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থের একটি শ্লোকে মদপানের স্বাভাবিক রীতি সম্পর্কে বিরুবাপাদ উল্লেখ করেছেন:

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধ অ।
চী অন বাকল অ বারুনী বন্ধআ।
* * *
দশমী দু আরত চিহ্ন দেখিআ
আইল গরাহক অপনে বহিআ
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাকি নিসারা।।
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্ত বিরুআ থির করি চাল।।

শ্লোকগুলির সরল অর্থ করলে দাঁড়ায়, ''এক শুঁড়িনী দুই ঘরে সান্ধে বা ঢোকে, সে চিকন বাকল দ্বারা বারুণী (মদ) বাঁধে। শুড়ির ঘরের চিহ্ন (আছে) দরজায় দেয়া থাকে সে চিহ্ন দেখে গ্রাহক নিজেই চলে আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হয়েছে, গ্রাহক যে ঘরে ঢুকল তাঁর আর সাড়াশব্দ নেই (মদের নেশায় এমনই বিভোর); সরুনালে একটি ঘড়ায় মদ ঢালা হচ্ছে; বিরুপা সাবধান করতেন, সরু নল দিয়ে চাল স্থির করে বারুনী ঢালো" (রায়, বাংলা ১৪০২, পৃ. ৪৪৮)।

শেক শুভোদয়ার এক কাহিনীতে দেখা যায়, রাজা লক্ষণ সেনের শ্যালক (রাজমহিষী বল্লভার ভাই) কুমার দত্ত এক বণিক বধু মাধবীর ওপর নির্যাতন করেছিলো। নির্যাতিতা মাধবী তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন করেও এই অপমানের প্রতিবিধান চেয়ে লক্ষণ সেনের রাজসভায় অভিযোগ করেন। রাজমহিষী বল্লভা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজা লক্ষণ সেন মাধবীর অভিযোগে নিরুত্তর থাকেন এবং রাজমহিষী স্বয়ং মাধবীকে অভিযোগ করার অপরাধে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করেন (মণ্ডল, n.d., পৃ. ৭২)। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত সহমরণ প্রথা ছিলো প্রাক-মুসলিম বাংলার পশ্চাৎপদ সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় গোঁড়ামিপূর্ণ এক অমানবিক নির্যাতনের নজির। স্বামীর সাথে

সহমরণকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়। এটি হিন্দুদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অনুসৃত একটি প্রথা ছিলো। এতে স্ত্রীকে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য করা হতো। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড বেনটিংক Bengal Sati Regulation প্রণয়ন করে এই প্রথা রহিত করেন (বাহাদুর, ১৯৭৬, পৃ. ৫২৬)।

মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বাংলায় বাংলাভাষার কোনোরূপ সম্মান ছিলো না। সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা গণ্যকারী ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সমাজে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়েছে (শাহনাওয়াজ, ১৯৯৯ পৃ. ১৭৬)। অন্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশই ছিলো শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং তাদেও ভাষা বাংলাও ছিলো অবহেলিত ও ঘৃণিত। ব্রাহ্মণগণ বাংলা ভাষাকে এই বলে অভিশাপ দিয়েছিলো যে, যারা পুরাণ ও রামায়ণ বাংলায় শোনে তারা রৌরব নামক নরকে প্রবিষ্ট হবে (Shahidullah, n.d., p.1)। এ কথা অবিদিত নয় যে, মুসলমান শাসকগণই ঘৃণা ও অবহেলার স্থান থেকে বাংলা ভাষাকে রাজদরবারের ভাষা হিসেবে সম্মান প্রদান করেন এবং বাঙালি কবি ও বিদ্বানদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে বাংলা ভাষাকে পরিপূর্ণ একটি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন মুসলমান শাসকগণের বাংলা ভাষার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন (সেন, ১৯৯১, পৃ. ৭৩-৭৫)।

নিম্নশ্রেণিকে এড়িয়ে চলা ছিলো হিন্দু উচ্চশ্রেণির অন্যতম একটি সংস্কার। তথাপি এই উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা নিম্নশ্রেণির ডোম্বিনীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত রতিক্রিয়ায় মিলিত হতে দ্বিধাবোধ করতো না। সে সময়ের একটি কবিতার উদাহরণ:

"নগর বাহিরেঁ ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ,
ছোই ছোই যাইসি বামহণ নাড়িআ।"

অর্থাৎ ডোম্বিনীর সঙ্গে মিলিত হবার আশায় ব্রাহ্মণরা তাদের ঘরের আশেপাশে সময়ে অসময়ে কামতাড়িত হয়ে ঘুরে বেড়াতো (মজুমদার, ১৯৯৫, পৃ. ৩৫)। বাৎস্যায়ন গৌড়ের যুবক-যুবতিদের কামলীলার কথা, তাদের কামনা ও পোশাকের কথা এবং বঙ্গের রাজদরবারের অভ্যন্তরে মহিলাদের সে ব্যভিচার, যৌনতা, ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের সঙ্গে তাদের কাম-ষড়যন্ত্রের বিবরণ লিখেছেন (রায়, বাংলা ১৪০২, পৃ. ৪৬৫)। ধোয়ীর *পবনদূত কাব্যে*ও কামচরিতার্থতার অবাধ লীলা সাড়ম্বরে বর্ণিত হয়েছে।

কেশব সেনের *ইদিলপুর লিপি* এবং বিশ্বরূপ সেনের *সাহিত্য পরিষদ লিপি*তেও সে সময়ের সমাজ-সংস্কৃতিতে অবাধ যৌনতার চিত্রগুলো ফুটে ওঠে। প্রতি সন্ধ্যায় বারাঙ্গনা সভানন্দিনীদের নিক্কণঝংকারে সভা ও প্রমোদগৃহ যৌনতা ও ব্যভিচারে মেতে উঠতো। সে সময়ে উচ্চস্থানীয় হিন্দুদের বাড়িতে দাসী রাখা হতো শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য। এ দাসীরা উত্তরাধিকার হিসেবে হাত পরিবর্তন হতে পারতো। এ ছাড়াও এ সময়ে বাংলায় দেবদাসীও ছিলো। *রামচরিত কাব্যে* এদের দেব-বারবণিতা, এবং *পবনদূতে* এদের বাররামা বলা হয়েছে (রায়, বাংলা ১৪০২, পৃ. ৪৬৬)। এসব বর্ণনায় তৎকালীন সমাজের উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের নৈতিক আদর্শ, বাসনা ও ব্যাসনের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ সে সময়ের হিন্দু নেতৃবৃন্দ এই বল্গাহীন কাম-বাসনার বিরুদ্ধে বক্তব্য ও লেখনি চালানো সত্ত্বেও, তারাই ছিলো এসব অপকর্মের মূল হোতা (রায়, বাংলা ১৪০২, পৃ. ৪৬৬-৪৬৭)। তৎকালীন হিন্দু সমাজে নারীদের স্বৈরিতারও অনেক নজির পাওয়া যায়। কুক্কুরীপাদের একটি গীতে বর্ণিত হয়েছে:

দিবসই বহুড়ি কাগ ডরে ভাতআ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ।।

অর্থাৎ বৌটির এতই ভয় যে, দিনের বেলা কাকের ভয়েই চিৎকার করে ওঠে, অথচ রাত হলেই কোথায় যে চলে যায় (রায়, বাংলা ১৪০২, পৃ. ৪৬৯)। হিন্দুদের মধ্যে তখনও যৌতুক প্রথা প্রচলিত ছিলো। এমনকি শ্রেণিকৌলিন্যের এত কঠিন যুগেও যৌতুকের লোভে অনেকেই নিম্নজাতের কন্যা বিয়ে করতে আপত্তি করতো না। এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা তৎকালীন কবিতার মূল বিষয় ছিলো। একটি সমাজের সাংস্কৃতিক অবকাঠামো কতটা নোংরামিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে এই সমস্ত কাব্য জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এ আমলের চর্যাপদের কয়েকটি লাইন এরকম:

'নর অ নারী মাঝে উভিল চীরা'।
অর্থাৎ - নর ও নারী মাঝে উর্ধ্ব করলাম লিঙ্গ"
(Shahidullah, n.d., p.12)

প্রাচীন বাংলায় বৈধব্যজীবন নারীজীবনের চরম অভিশাপ বিবেচিত হতো। বিধবা হিন্দু মহিলাগণকে সিঁদুর, প্রসাধন অলঙ্কারসহ সমস্ত সুখ-সম্ভোগ ও মাছ-মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হতো। ব্রাহ্মণরা তাদের সহমরণে যাবার জন্য উৎসাহিত করতো (রায়, বাংলা ১৪০২ পৃ. ৪৭৪)। উঁচু সমাজে নারীদের সতীত্বের গুরুত্ব কিছুটা থাকলেও এই সমাজের পুরুষদের অনেকেই ব্যভিচারে অভ্যস্ত ছিলো (সুর, ১৯৮৬, পৃ. ১৫৫-১৫৬)।

প্রাক-মুসলিম সময়ে বাংলায় জনজীবনে অপসংস্কৃতির ছোবলে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ শ্রেণির লোকেরা। আর গোটা সমাজে অশ্লীলতা ও যৌনতার ছড়াছড়ি ঘটিয়েছিলো উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজ। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হিন্দুদের নিম্নবর্ণের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে কোন বাধা না থাকলেও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কখনই উচ্চবর্ণে বিয়ে করতে পারতো না। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সৌন্দর্য্য ও যৌতুকের লোভে অনেক সময় নিম্নবর্ণে বিয়ে করলেও তারা কখনোই সামাজিক মর্যাদা পেতো না (তালিব, ১৯৮০, পৃ. ৪৫)।

অষ্টম শতকের বাংলায় হিন্দুধর্মের নামে যৌন অনাচারে সমাজ কলুষিত হয়ে ওঠে। দ্বাদশ শতকের সংস্কৃত লেখক কলহন এর '*রজতরঙ্গিনী*' গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধনের কোহনা মন্দিরের কমলা নাম্নী প্রধানা দেবদাসীর কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এজাতীয় দেবদাসীদেও অনেকে গোটা বাংলায় তাদের রূপসৌন্দর্য্য, ছলাকলা ও যৌনতার বিভিন্ন কলাকৌশল প্রদর্শন করে সমাজের উচ্চস্থানীয় লোকদের কামনা ও বাসনা পুরণের একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলো। সে যুগের বিখ্যাত কবি ধোয়ী, সন্ধ্যাকর নন্দী, ভবদেব ভট্ট, বিবিধ শব্দালংকারে তাদের সৌন্দর্য্য, বিলাস, লাস্য ও কাম কলাভিজ্ঞতার প্রশস্তি রচনা করেছেন। ভবদেব ভট্ট এই বারবণিতাদের রূপ-যৌবন বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন, বিষ্ণু মন্দিরে উৎসর্গীকৃত শত দেবদাসী যেন কামাতুরদের কারাগৃহ, যেন সংগীত লাস্য ও সৌন্দর্য্যের সভামন্দির এবং এদের দৃষ্টিমাত্রে ভস্মীভূত কাম পুনরুজ্জীবিত হয়। শারদীয় দূর্গাপুজার সময় গ্রামে-নগরে নারী-পুরুষ সামান্য গাছের পাতার পোশাক পরিধান করে কোনো রকমে লজ্জা নিবারণের ছলনায় সারা গায়ে কাদা মেখে নানা রকম যৌনক্রিয়াগত অঙ্গভঙ্গি সহকারে এবং কুৎসিত ভাষায় অশ্লীল যৌন বিষয়ক গান গেয়ে গেয়ে উন্মত্তের মত নৃত্য করতো (তালিব, ১৯৮০, পৃ. ৪৫-৪৬)। চৈত্র মাসে কাম মহোৎসবেও বাদ্য সহকারে এক প্রকারের অশ্লীল সংগীত গীত হতো। 'হোলাকা' নামে এক ধরনের উৎসব চালু ছিলো। বর্তমানে এটি হোলি উৎসব

নামে চালু আছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এতে যোগদান করতো। 'দ্যুত প্রাতপদ' নামে একটি বিশেষ উৎসব কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপাদে অনুষ্ঠিত হতো (মজুমদার, ১৯৯২, পৃ. ২০৩)।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির অবস্থার এই অধঃপতনের পেছনে তৎকালীন মানুষের সমাজ, জাত-বর্ণ এবং অর্থনৈতিক শ্রেণি উভয়দিক থেকে স্তরে স্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্তি এবং পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব। দ্বিতীয়ত, তৎকালীন জনজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্প-সাহিত্যে দৈনন্দিন জীবনে যৌন অনাচার, নির্লজ্জ কামপরায়ণতা, মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা এবং রুচির অভাব (রায়, ১৪০২, পৃ.৭২১-৭২২)। ধর্মের নামে অধর্ম, সামাজিকতার বদলে অসামাজিকতা, সংস্কৃতির স্থানে অপসংস্কৃতি এই সময়ের বাংলাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালীর ইতিহাস* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ''একটা বৃহৎ গভীর ব্যাপক সামাজিক বিপ্লবের ভূমি পড়িয়াই ছিলো, কিন্তু কেহ তার সুযোগ গ্রহণ করে নাই। মুসলমানেরা না আসিলে কীভাবে কী উপায়ে কী হইত বলিবার উপায় নাই" (রায়, ১৪০২, পৃ. ৭২২)।

যে কোন সমাজের জন্য সে সমাজের মানুষের নৈতিক শক্তি সমাজ জীবনের মেরুদণ্ড। আর যে সমাজ থেকে এই দিকটি দুর্বল হয়েছে সে সমাজও ধীরে ধীরে পতনের দিকেই এগিয়ে গেছে। তৎকালীন বাঙালি সমাজে নৈতিক বল ও চরিত্রবলের অভাব সুস্পষ্ট। সেন বংশীয় রাজাগণ এবং এমনকি রাজা লক্ষণ সেনও এই দুর্বলতার গণ্ডি থেকে বের হতে পারেননি। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষ সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতো। তৎকালীন রাজকবি হলায়ুধ মিশ্রের কাব্যেও হিন্দুদের নিন্দা ও মুসলমানদের গুণকীর্তণের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় (মণ্ডল, n.d., পৃ. ৭৩)।

অষ্টম ও নবম শতক থেকে বাংলা ইসলামের সংস্পর্শে আসতে থাকে। সিন্ধু অঞ্চল মুসলমান নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার পর থেকে এতদঞ্চলে তাঁদের আগমন বৃদ্ধি পায়। এ সময়েই বাংলা ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে শুরু করে। বাংলায় ইসলাম প্রচারে উলামা-মাশাঈখ ও সুফি-সাধকগণ ব্যাপক অবদান রেখেছেন। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ইসলাম প্রচারক উলামা-মাশাঈখবৃন্দ বাংলায় ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের অনেকেই ইসলাম প্রচারের স্বার্থে এ দেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং এদেশবাসীর ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করে তাঁদের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে ইসলামের মহান বাণীকে তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। ধৈর্য, ত্যাগ ও পরিশ্রমের ফলে বাংলার জনগণের ব্যাপক অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এ সমস্ত উলামা-মাশাঈখ বাংলায় আগমন করেন। এদের অধিকাংশই আরব এবং ইরানীয় বংশোদ্ভূত (আলী, ২০০২,পৃ. ৪১)। এদের কেউ কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে এবং কেউ কেউ শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছেন। আল কুরআনের নির্দেশনা এবং মহানবীর (স.) বাণীকে উপলক্ষ করে উলামা-মাশাঈখ ধর্মীয় কর্তব্যবোধের তাগিদে শহর-বন্দরসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তাদের ধর্মীয় অনুরাগ, ধর্ম প্রচারের আগ্রহ, আদর্শ চরিত্র ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলির দ্বারা সাধারণ মানুষ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে (আহমদ, ১৯৯৯, পৃ.২৪)।

ইসলামের বিধানাবলি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণের মাধ্যমে উলামা-মাশাঈখ ও সুফি সাধকগণের নৈতিক চরিত্রে সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্যের যে সমাহিত চিত্র ফুটে উঠেছিলো তা বাংলার সাধারণ মানুষকে একদিকে যেমন আকৃষ্ট করেছে, তেমনিভাবে বাংলার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিজয়ে এবং বাংলাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহতকরণে এ বিষয়গুলো যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। উলামা-মাশাঈখ সে সময়ে সমাজের নিগৃহীত হতদরিদ্র

বঞ্চিতদের আশ্রয়স্থল ও আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। সমাজে তাঁদের বিপুল জনপ্রিয়তায় বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম নৃপতি, বিজেতা ও শাসনকর্তাবৃন্দ রাজ্য বিজয় অথবা ইসলাম ধর্মের গৌরব মহিমা প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহায্য কামনা করতেন। তাঁরা কখনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে অস্ত্র ধরেছেন, আবার কখনো তাঁরা নিজেরাই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যুদ্ধবিজয়ী এই উলামা-মাশাঈখের কেউ কেউ বিজিত ভূখণ্ডের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে সমাজে ইসলাম প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলায় ইসলাম প্রচার করতে এসে এ সমস্ত উলামা-মাশাঈখকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক বহু সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করতে হয়েছে। হিন্দু অধ্যুষিত বাংলায় স্বাভাবিকভাবেই এ সমস্ত উলামা-মাশাঈখকে ইসলাম প্রচারে হিন্দু রাজা ও সমাজপতিদের কোপানলে পড়তে হয়েছে। হিন্দু রাজা ও সমাজপতিদের অকথ্য নির্যাতনে জর্জরিত হতে হয়েছে তাঁদের। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের কার্যধারাকে বন্ধ ও ব্যাহত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে উলামা-মাশাঈখকে অনেক সময়ে বাধ্য হয়েই তাদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। এ সংগ্রামে কখনো তাঁরা নৈতিকভাবে বিজয়ী হয়েছেন, কখনো যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিহত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের জীবন, কর্ম, চরিত্র, চিন্তা, চেতনা চারপাশের অমুসলিম তথা হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপরে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এরই এক প্রেক্ষাপটে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা জয় করেন। ফলে পরবর্তীতে ইসলাম প্রচারের ধারা রাজকীয় নেতৃত্বে ব্যাপকভাবে অগ্রসর হতে থাকে (করিম,১৯৯৯,পৃ. ১৫৮)। বাংলা বিজয়ের পূর্বে বাংলায় ইসলাম প্রচারে উলামা-মাশাঈখ কোন রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ তো দূরের কথা প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। বরং তাঁদের ইসলাম প্রচারে পরবর্তীতে বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির আগমন ও মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়েছিলো।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের সময় থেকে এই অঞ্চলের মুসলমানদের বসতি ব্যাপকভাবে শুরু হয়। মুসলিম বিজয়ের ফলে বাংলার সমাজজীবনেও পরিবর্তনের আভাস পরিলক্ষিত হতে থাকে। এ সময় থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তর থেকে প্রচারকবৃন্দ ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করতে থাকেন। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, খ্যাতনামা তুর্কি সেনাপতি বখতিয়ার খলজির লক্ষণাবতী অধিকারের পূর্বেই কিছু সংখ্যক আরব বণিক বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ অভিমতের প্রামাণ্য দলিল না থাকলেও ধারণা করা হয়, বাংলায় অনেক আগে থেকেই ধর্ম প্রচার অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণের যাতায়াত ও যোগাযোগ ছিলো (রহিম, ১৯৮২, পৃ.৩১-৩৯)। মুসলিম বিজয়ের ফলে বঞ্চিত নিম্নশ্রেণির হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা ইসলামের নিয়মনীতির ঔদার্যে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হতে থাকে। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার জনসংখ্যার অধিবাসীদের এক বিরাট অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দুদের সামাজিক অনাচার উশৃঙ্খলতা, অশ্লীলতা ও যৌনতার বিরুদ্ধে ইসলামের মহান আদর্শ, উদারতা, নৈতিকতা দর্শনে স্থানীয় বাঙালি সমাজ ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করতে থাকে। দুই ধর্মের সম্প্রীতি ও সহাবস্থান সহজ ছিলো না। এক্ষেত্রে ইসলামের উদারতায় তৎকালীন সমাজে হিন্দু সমাজের দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করলেও হিন্দুরা সমাজে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি।

মুসলমানগণ বাংলায় বিজয়ীর বেশে এ দেশে আগমন করার পর এদেশকে তাঁরা মনেপ্রাণে ভালবেসেছিলো, এ দেশকে স্থায়ী আবাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করে এবং এ দেশের অমুসলিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে চেয়েছিলো। শাসক হিসেবে শাসিতের উপরে কোনো অন্যায় অবিচার তাঁরা করেনি। জনসাধারণও তাঁদের শাসন মেনে নিয়েছিলো। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের পর অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

করেন। বিজয়ের পরপরই তিনি বাংলায় মানুষের জন্য মসজিদ, মাদরাসা ও উপাসনালয় নির্মাণ করেন (মীনহাজ-ই-সিরাজ, ২০০৭, পৃ. ২৭)। একজন বিজেতা হিসেবে বাংলার অমুসলিমদের প্রতি তিনি উদার নীতি অবলম্বন করেন। যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেন:

> ..But he was not blood-thirsty, and took no delight in massacre or inflicting misery on his subjects. The problems of internal administration and the conciliation of his military chiefs were together solved by the establishment of a sort of feudal government in the country. (Sarkar, 2006, p. 9)

এই কারণে বাংলার অধিবাসীরা বখতিয়ারকে শুধু গ্রহণই করেনি, তাদের অনেকেই তার হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। এমনকি সেনাদলের নেতৃত্বও দিয়েছে। আলী মেচ তেমনই একজন ব্যক্তি (সিরাজ, ২০০৭, পৃ. ২৭)। বখতিয়ার খলজির পরবর্তী শাসকগণও দেশ পরিচালনায় তাঁর নীতি অবলম্বন করেছিলেন। মুসলিম শাসকগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, দেশের সকল শ্রেণির মানুষের কল্যাণের মাধ্যমেই রাষ্ট্র সুচারুভাবে পরিচালনা সম্ভব। এ জন্য ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকলের কল্যাণে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিবেচনা না করে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মূলত তাদের এই নীতির ফলেই সকল শ্রেণির নাগরিকের সহযোগিতায় বাংলার সমাজকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছেন। মুসলমান শাসকগণ মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন মকতব, মাদরাসা ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন, তেমনি হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্যও শিক্ষার দরজা রেখেছিলেন অবারিত (সিরাজ, ২০০৭, পৃ. ২৭)।

এসময় হিন্দু বালিকারাও পাঠশালায় পড়াশোনা করতে যেত। ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের *বঙ্গসাহিত্য পরিচয়* সূত্রে জানা যায় যে, জনৈকা রাজকন্যা ময়নামতি তার পিতার গৃহসংলগ্ন পাঠশালায় গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করতো। *সারদা মঙ্গল কাব্যের* উদ্ধৃতি দিয়ে ড. দীনেশ চন্দ্র লেখেন যে, একটি পাঠশালায় হিন্দু রাজার ছেলেমেয়েরা অন্যদের সঙ্গে শিক্ষালাভ করেছিলো। এই পাঠশালায় পাঁচ রাজার কন্যা সন্তান অন্যান্য বালক ছাত্রের সঙ্গে অধ্যয়নরত ছিলো। এই বর্ণনা থেকে হিন্দু সমাজের দুটি চিত্র ফুটে ওঠে। প্রথমত, স্বতঃস্ফূর্ত নারীশিক্ষা প্রচলন, দ্বিতীয়ত, সহশিক্ষার প্রসার। হিন্দু সমাজের উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের সম্পর্কেও বহু তথ্য বিভিন্ন উপাদানে উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রামী, মাধবী, চন্দ্রাবতী, খনা, বিদ্যা, রানী ভবানী প্রমুখ মহিলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। বাংলার সুলতানি পর্বে কয়েকটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিলো নবদ্বীপ। বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের খ্যাতি সম্পর্কে চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ করেন যে, নবদ্বীপে বহু টোল ছিলো এবং সেখানে ছিলেন হাজার হাজার খ্যাতনামা পণ্ডিত, বিদ্বান ব্যক্তি ও অধ্যাপকবৃন্দ।

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থে দুর্গাদাস সান্যাল লিখেছেন যে, ইলিয়াস শাহী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই রাজশাহী জেলায় বিখ্যাত সান্যাল এবং ভাদুড়ি পরিবারের উৎপত্তি হয়। ইলিয়াস শাহ জয়ানন্দ ভাদুড়িকে দীওয়ান, সুবুদ্ধি খান (খান উপাধি মুসলমান শাসক থেকে প্রাপ্ত), শিখাই সান্যালকে সেনাপতি পদে দায়িত্ব দেন। অভূতপূর্ব কর্তব্যপরায়ণতার জন্য শিখাই সান্যালকে সুলতান চলনবিল এলাকার বিশাল এলাকা জায়গির মঞ্জুর করেন। কালক্রমে এই জায়গার নাম হয় সান্যালগড়। সোনারগাঁওয়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের রাজত্ব উত্তরকালে ভাতুড়িয়ার কংস নামক এক ব্রাহ্মণ উজির পদ লাভ করেন। তবে এই কংস রাজা পরবর্তীতে মুসলমান উচ্ছেদের

অভিপ্রায়ে সচেষ্ট ছিলেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও হিন্দুদের প্রতি তিনি উদার ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। রূপ ও সনাতন নামক দুই ভাই তাঁর মন্ত্রী ছিলো। রূপের উপাধি ছিলো দবীর খাস বা মুখ্য সচিব এবং সাকের মালিক ছিলো সনাতনের উপাধি। সনাতনের বড় ভাই রঘু নন্দন এবং ছোট ভাই বল্লভও সুলতানি দরবারের একজন উচ্চপদে কর্মরত কর্মকর্তা ছিলেন। বল্লভের উপাধি ছিলো অনুপম মল্লিক। কেশব বাবু রাজার দেহরক্ষীদের নায়ক ছিলেন। তিনি রাজার নিকট থেকে খান ও ছত্রী উপাধি পান। এই কারণে তাকে কেশব খান বা কেশব ছত্রী বলা হতো (রহিম, ১৯৮২,পৃ. ২৯৩)। সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের অধিকারী বা গৌড়ের শাসনকর্তা অথবা গৌড়ের কোতওয়াল। মুকুন্দ দাস সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর পিতা নারায়ণ দাস ছিলেন বারবক শাহের চিকিৎসক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই পরিবারটি পুরুষানুক্রমে রাজবৈদ্য ছিলেন। এ ছাড়াও রামচন্দ্র খান, চিরঞ্জীব সেন, যশোরাজ খান, দামোদর, কবি রঞ্জন, হিরণ্য দাস, গোবর্ধন দাস, গোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ আরো হিন্দু কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। এরা সকলেই উচ্চ রাজপদে কর্মরত ছিলেন। ধারণা করা যায় যে, নিম্নপদেও অনেক হিন্দু কর্মরত ছিলেন যাদের নাম সূত্রে পাওয়া যায় না। রূপ সনাতনরা চার ভাই একসঙ্গে চাকুরি করতেন। রূপ সনাতনের ভগ্নিপতি শ্রীকান্তও রাজসরকারে উচ্চপদে চাকুরি করতেন। তাঁর কর্মস্থল ছিলো হাজীপুর। তিনি সেখানে ঘোড়া কেনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন (করিম, ২০০৮, পৃ. ৩৩৫)। প্রদত্ত উপাধি থেকে অনুধাবন করা যায় যে, সুলতানি আমলে তাঁদের বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো। হিন্দুদের প্রতি সুলতানদের এমন উদারতাকে অনেক হিন্দু লেখক ভিন্নভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, হোসেন শাহ কর্তৃক হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগের মাধ্যমে হিন্দুদের প্রতি তাঁর উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর মতে:

> সব সময়ে সমস্ত কাজের জন্য যোগ্য মুসলমান কর্মচারী পাওয়া যেত না বলে হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথা বাংলাদেশে অনেক দিন আগে থেকেই চলে আসছিলো; রুকনউদ্দীন বারবক শাহের আমলেও বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং হোসেন শাহ এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সুলতানদের প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। ....এতে রাজা হিসাবে তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার প্রমাণ পাওয়া যায়, হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাবের প্রমাণ মেলে না। (মুখোপাধ্যায়, ২০০০, পৃ. ৫৪৪)

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের উপরিউক্ত মতামতের বিরোধিতা করে আবদুল করিম বলেন:

> সুলতানি আমলে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করার মতো যোগ্য মুসলমান পাওয়া যাইত না, এই কথা ঠিক নয়। আরব, তুর্কিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার মত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হইতে শিক্ষিত এবং দক্ষ মুসলমানেরা প্রায়ই ভারত উপমহাদেশে আগমন করিত এবং উচ্চ রাজপদ লাভ করিত, তাহাদের আগমন তখনও বন্ধ হয় নাই। ইহার প্রমাণ এই যে, দিল্লী সাম্রাজ্যে এই সকল বহিরাগত মুসলমানেরা রাজপদে নিযুক্তিতে প্রাধান্য লাভ করিত। বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন বন্ধ ছিলো না, সুতরাং বাংলাদেশে যোগ্য কর্মচারীর অভাব হওয়ার কথা নয়। ....ইহা একদিকে তাঁহার বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শীতার যেমন প্রমাণ, অন্যদিকে তাঁহার উদারতার প্রমাণও বহন করে। (করিম, ২০০৮, পৃ. ৩৩৫)

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, বাংলার সুলতানিপর্বে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুদের সুযোগ সুবিধা পেতে কোনো বাধা হয়নি। বাংলার সুলতানগণ শিক্ষিতজন ও দক্ষ মানুষের যেমন মূল্যায়ন করতেন, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসনকার্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার দেয়ারও পক্ষপাতী ছিলেন।

মুসলমানগণ শাসকজাতি হলেও, তাঁরা হিন্দুদের থেকে দূরে থাকেননি কিংবা হিন্দুদেরকেও দূরে সরিয়ে রাখেননি। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁদেরকে সংযুক্ত রেখেছেন। যোগ্যতা ও প্রতিভাকে মর্যাদা দিয়ে তাঁরা পণ্ডিত, কবি, বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন এবং হিন্দুদের সরকারি পদ, উপাধি ও জমি দান করে মর্যাদা দান করেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৯২)।

সুলতান ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সালতানাতের বিরুদ্ধে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু সামন্ত জমিদার, সেনাপতি ও সৈনিকদের সমর্থন ও সাহায্য করেন। তিনি দুর্যোধন নামক একজন কর্মচারীকে 'বঙ্গভূষণ' এবং চক্রপাণিকে 'রাজজয়ী' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ছাড়াও তিনি কয়েকজন হিন্দু জমিদারকে সম্মানজনক উপাধি প্রদান করেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৯৩)। সুলতান জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও কবি বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রায়মুকুট' ও অন্যান্য উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন এবং তাঁকে সৈন্যদলে উচ্চপদ প্রদান করেন। মুসলিম শাসকগণ রাজ দরবারে হিন্দু পণ্ডিত ও কবিদের আহবান করে তাদের সঙ্গে হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করতেন। হিন্দুদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে গভীর আগ্রহ উপলব্ধি করে তাঁদের মাধ্যমে রামায়ণ, মহাভারত, ভগবত ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করান। সংস্কৃত ভাষার মরমীবাদ গ্রন্থটিও আরবি ও ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে মুসলমানদের এ ধরনের আগ্রহের পশ্চাতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নততর সামাজিক সমঝোতা সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৯৪)। সুলতানি শাসকগণ হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেন। ফলে হিন্দুগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপনে, শিক্ষায় ও ধর্মপ্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ হিন্দু সংস্কারবাদী বিপ্লবী শ্রী চৈতন্যের বিপ্লবী মতবাদ প্রচারে কোনো ধরনের বাধা প্রদান না করে সহযোগিতা করার জন্য তাঁর প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৯৫; শাহনাওয়াজ, ২০০৮, পৃ. ১৪৪)। সামাজিকভাবেও মুসলমানরা হিন্দু প্রতিবেশীদের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল ছিলো। একবার হিন্দু সম্প্রদায়ের দুই গ্রুপের মধ্যে এক সমস্যা ও সংঘর্ষের বিচার করতে গিয়ে কাজী সাহেব এক গ্রুপের পক্ষে রায় প্রদান করলে অপর পক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বাড়ি পুড়িয়ে ফেলে। কাজী সাহেব চাইলে এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি আপোষমূলক নিষ্পত্তির অভিপ্রায়ে দোষী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধানের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ভাগ্নে সম্বোধন করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। *চৈতন্যচরিতামৃত* কাব্যে নিম্নোক্ত কবিতাটি উল্লেখ আছে, কাজী সাহেব এইভাবে সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন:

> "গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা
> দেহ সম্বন্ধে হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা
> নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা
> সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা" (মজুমদার, ১৯৯২, পৃ. ৩২৫)।

এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভ্রাতা-ভগ্নি, ভাগ্নে ইত্যাদি স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতেন (শাহনাওয়াজ, ২০০৮,পৃ. ১৪৪)। দীর্ঘ সুলতানি আমলের দুই-একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ব্যতীত হিন্দুরা মুসলমানদের বন্ধুসুলভ মনোভাবের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। বাংলার সাধারণ স্বার্থরক্ষায় তাঁদের জমিদার, শাসক ও অন্যান্যরা মুসলমানদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। মুসলমান সুলতানগণ যেমন তাঁদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের নিয়োগ দিতেন, হিন্দু জমিদাররাও তাঁদের বিভিন্ন কাজে

মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তাঁরা মুসলমান রাজদরবারের শিষ্টাচার ও আনুষ্ঠানিকতায় মুগ্ধ হয়ে সেগুলো নিজেদের দরবারে অনুসরণ করতেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৯৫)।

সুলতানি শাসনকালে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিলো। হিন্দুরা তাদের বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক উৎসবে মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করতো, মুসলমানরাও তাদের এসকল আনন্দ উৎসবে যোগ দিতো। কবি বিজয়গুপ্ত বলেন, চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষ্মীন্দরের বিয়েতে নয়শত মুসলমান গায়ক যোগদান করেছিলেন (বিজয়গুপ্ত, ১৯৪৩, পৃ. ১৭৯; রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৯৬)। মুসলমানগণও তাদের সামাজিক উৎসবাদিতে হিন্দুদের আমন্ত্রণ জানাতেন। এভাবে সামাজিক লেনদেন ও চিন্তাধারার আদান-প্রদানের ফলে হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পর সম্পর্কে সম্মক ধারণা অর্জন করতে পারে। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ স্বভাবতই মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত হিন্দুদের ভক্তি জাগরিত করেছিলো। একে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের ফলে বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পথ প্রশস্ত হয়েছিলো। সে সময়ের অনেক ব্রাহ্মণ ব্যবসা-বাণিজ্য শুরুর শুভক্ষণে ও পুত্র সন্তান কামনায় আল্লাহর নাম নেয়ার পরামর্শ দিতেন। মুসলমানদের পীর দরবেশদের দরগাহসমূহের শিরনী বা উপঢৌকন প্রদান হিন্দুদের মধ্যেও সমানভাবে প্রচলিত ছিলো। পীর দরবেশকে তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখতো। তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করতো। যুগ যুগ ধরে শেখ জালালউদ্দীন তাবরিজীর প্রতি হিন্দুদের ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন *শেক শুভোদয়া* গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরা কবিতার প্রারম্ভে মুসলমান পীর দরবেশদের প্রশস্তি লিখে শুরু করতেন (রহিম, ১৯৮২, পৃ. ২৯৭)।

মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবনে ভেদাভেদ থাকলেও বিরোধ ছিলো না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মুসলমানদের আল্লাহ রাসুল এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের প্রতি হিন্দু সমাজ মানসের সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের *মনসা মঙ্গল কাব্যের* নায়ক শৈব সাধক ভাগ্য বিড়ম্বিত চাঁদ সওদাগর পুত্র লক্ষ্মীন্দরকে সর্পদেবী মনসার আক্রোশ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীন্দরের লৌহ বাসরে অন্যান্য হিন্দুস্থানী রক্ষাকবচের সঙ্গে একখানা কোরআন শরীফও রাখা হয়েছিলো (সেন, ১৯৯১, পৃ. ৩১৯)। অপুত্রক লক্ষপতি সওদাগর তার অপুত্রক হওয়ার কারণ জানতে ব্রাহ্মণদের ডাকলে তারা আল কুরআন দেখে অঙ্কপাত করেন। অনুরূপ লক্ষপতি সওদাগরের পুত্র বাণিজ্য যাত্রাকালে হিন্দু দেবদেবীকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকেও স্মরণ করেছেন (Mallick, 1965, p. 9)। সামাজিক জীবনের এই প্রভাব হয়তো সর্বব্যাপী ছিলো না, তবে মুসলিম সমাজের ধর্মকর্মের প্রতি কিছু কিছু হিন্দুর যে উদার মনোভাব ছিলো এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সমকালীন হিন্দু কবিদের কেউ কেউ হিন্দু মুসলিম চরিত্র চিত্রায়নে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গীর উর্ধ্বে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মুসলমান শাসক ও ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন নিয়মনীতি, এমনকি নবী রাসুল এবং মুহম্মদের (স.) দৌহিত্র হাসান হোসেনকে আক্রমণ করতেও তাঁরা ছাড়েন নি। জবাবে মুসলমান কবিরা অনেক সময় তাদের মনোভাবের জবাব নিজেদের রচনার মাধ্যমেই ব্যক্ত করেছেন। এই সমস্ত বিরোধ সমাজকে তেমনভাবে আলোড়িত করেনি, বরং সমাজের মানুষকে ধর্ম সচেতন জাতিতে পরিণত করেছিলো। *চৈতন্য মঙ্গলের* কবি জয়ানন্দ এসকল বিষয় লক্ষ্য করে লেখেন, 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে' (জয়ানন্দ, ১৩১২, পৃ. ১১)। দীনেশচন্দ্র সেন (১৯৯১) তাঁর *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থে মুসলমান আগমনের পর বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

> মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এ দেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেব

> মন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল; মহরম, ঈদ, সবেবরাত প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ন ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এ দেশে বাসকরার ফলে বাঙ্গালা তাহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাহাদের পরম কৌতূহল হইল। ...গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল। গৌড়েশ্বর নসরত শাহ মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। সেই মহাভারতখানি এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কিন্তু পরাগল খাঁর আদেশে অনূদিত পরবর্তী মহাভারতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে গৌড় বা লাখনৌতিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজের বিকাশ শুরু হয়। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহী বংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে মুসলিম শাসন স্থাপিত হয়। সুতরাং বখতিয়ারের বিজয় থেকে শামসুদ্দীন ইলিয়াশ শাহের উত্থানকালকে মুসলিম সমাজ গঠনের প্রস্তুতিপর্ব বলা চলে। মুসলমান সমাজের সঙ্গে উপাসনাগৃহ মসজিদের সম্পর্ক অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত ছিলো। যেখানেই মুসলমান বসতি গড়ে উঠতো, সেখানেই ধর্মীয় প্রয়োজনে গড়ে তোলা হতো মসজিদ, মাদরাসা ও দরগাহ। সমাজের সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের কল্যাণে মুসলমান সুলতান এবং তাদের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে কূপ, জলাধার, পুকুর খনন অথবা সেতু নির্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করা হতো। মুসলিম দেশের জনগণ হিসেবে হিন্দুরাও এ জনহিতকর কাজের সুবিধা পেয়েছিলো। এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম সুলতানদের সঙ্গে হিন্দু জনসাধারণের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কথা বিবেচনা করা যায়। বখতিয়ার খলজি বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তথা হিন্দুদের আস্থা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিজেদের শাসনকার্যে দক্ষতা প্রদর্শন, সকল কার্যে সমভাবে সকলের সন্তুষ্টি অর্জন, সর্বোপরি অধিকার, সম্মানহারা অবহেলিত হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সম্মান প্রদানের মাধ্যমে মুসলমান শাসকগণ নিজ ধর্মে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলায় মুসলমান সমাজ সম্প্রসারণের প্রধান কারণ ছিলো বহুসংখ্যক হিন্দুর ইসলাম গ্রহণ। এর ফলে মুসলমান সমাজ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের হিন্দুদের সঙ্গে বাংলায় আগত মুসলমান জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতির গ্রহণ ও বর্জন সাধিত হয়েছে। মুসলমান সুলতানগণ বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে হিন্দুদের পূর্বের কিছু কিছু নিয়ম, রীতি-নীতি পরিবর্তন করতে চাননি; বরং এসকল বিষয়ে উদারনীতি অবলম্বন করেছিলেন। যেমন, বখতিয়ার খলজির প্রাপ্ত মুদ্রায় একজন অশ্বারোহীর চিত্র খোদিত আছে। বাংলার আরো কয়েকজন মুসলমান শাসনকর্তার মুদ্রায় অনুরূপ চিত্র সংযোজিত হতে দেখা যায় (শাহনাওয়াজ, ২০০৮, পৃ. ১৫৯)।

জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ্'র একটি রৌপ্য মুদ্রায় সাতরশ্মি সংযুক্ত সূর্যের প্রতীক উৎকীর্ণ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসলাম ধর্ম প্রাণিচিত্র অঙ্কন বা মূর্তি খোদাই করা সমর্থন করে না। অন্যদিকে এ দেশের জীবন ধারায় হিন্দুধর্ম ও সমাজে মূর্তি পূজা ও মূর্তি তৈরি বা অঙ্কন এবং সংরক্ষণ একটি আবশ্যকীয় ধর্মীয় কাজ। আবার সূর্যের প্রতীকের সঙ্গে সূর্যপূজাও সম্পর্কিত রয়েছে। মুসলিম মুদ্রায় তাই লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি, নাগরী লিপিবিন্যাস, অশ্বারোহীর মূর্তি অঙ্কন এবং সূর্যের প্রতিকৃতি খোদাই বিশেষ তাৎপর্যের দাবি রাখে। বাংলার সুলতানদের মধ্যে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার চেয়ে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিলো বেশি। ফলে ধর্মীয় বিধি নিষেধকে উপেক্ষা করে সহজেই তাঁরা তাঁদের মুদ্রায় অশ্বারোহী অথবা সূর্যের প্রতিকৃতি খোদাই করতে পেরেছেন। এ থেকে মুসলিম সুলতানদের ধর্মীয় রক্ষণশীলতার দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় উভয় ধর্মের সাদৃশ্যকরণ প্রবণতারই প্রমাণ পাওয়া যায় (শাহনাওয়াজ, ২০০৮, পৃ. ১৩০-১৩১)।

হিন্দুরাও মুসলমানদের কাছ থেকে তাঁদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, আচরণ অনেকাংশে গ্রহণ করেছিলো। এ কথা সত্য যে, প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানদের কাছ থেকে সাধারণ হিন্দুরা ততটা বৈরি দৃষ্টিভঙ্গি পায় নি, নিজ ধর্মের নেতৃত্বের কাছ থেকে যতটা পেয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহের সময় গৌড়ের সাদুল্লাপুরে নির্মিত মসজিদের গায়ে সংস্থাপিত শিলালিপির সাক্ষ্য উপস্থাপন করা যায়। এই মসজিদের শিলালিপির পাঠ থেকে বোঝা যায়, বিবি মালতি নামের এই মহিলা মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন (খান, ২০০৯, পৃ. ১১০; Ahmad,1960, pp. 238-239; Karim, 1992, pp.365-366; শাহনাওয়াজ, ২০০৮, পৃ. ৪৫)। 'বিবি' শব্দ মুসলিম মহিলাদের নামের সঙ্গেই সাধারণত যুক্ত হয়, কিন্তু মালতি শব্দটি একবারেই বঙ্গজ, বিশেষ করে হিন্দু নারীর নাম হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হয়। কানিংহামের ধারণা, বিবি মালতি সুলতান মাহমুদ শাহের পরিবারেরই একজন। ধারণা করা যায়, বিবি মালতি হিন্দু পরিবার থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম পরিবারে এসেছেন। সাধারণত ধর্মান্তরিত নওমুসলিমদের একটি অর্থপূর্ণ আরবি নাম দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে বিবি শব্দটি সংযুক্ত হয়ে প্রকৃত হিন্দু নামটি মসজিদের শিলালিপিতে উৎকীর্ণ হওয়া তৎকালীন সমাজ ও নেতৃত্বের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও সহনশীলতার নজির বহন করে (শাহনাওয়াজ, ২০০৮, পৃ. ১৩২)।

মুসলিম শাসকবৃন্দ বাংলা বিজয়ের পর হিন্দুদের নির্যাতন, হিন্দু উপাসনাগৃহ মন্দির ধ্বংস, কোথাও কোথাও মন্দিরের স্থানে মসজিদ নির্মাণ এবং কোথাও বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাথর দিয়ে মসজিদ স্থাপনা দেয়াল সাজিয়েছেন – এমন অনেক অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, মাধাইপুরের গুণবন্ত মসজিদসহ আরো অনেক মসজিদের নাম উল্লেখ করা হয়। উল্লেখ্য, আদিনা মসজিদের দেয়ালে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ব্যবহার করা হয়েছে এবং মসজিদের পূর্ব পাশের দেয়ালে বৃষ্টির পানি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যে ছিদ্র রয়েছে তার মুখে প্রস্তর নির্মিত একটি কুমির শায়িত অবস্থায় আছে। কুমিরটির মুখের ভেতর দিয়ে বৃষ্টির পানি প্রাঙ্গন থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। গুণবন্ত মসজিদ সম্পর্কে অভিযোগ হচ্ছে গুণবন্ত নামে এক ব্রাহ্মণের গড়া মন্দিরের উপর এটি নির্মিত হয়েছে। এ ধরনের অনেক মসজিদ রয়েছে যে গুলোতে হিন্দু স্থাপনার অনেক নিদর্শন – ইট, পাথর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে তাদের ধারণা, মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবই এ কাজে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। তাদের আরো অভিযোগ বখতিয়ার খলজি বাংলায় এসেই মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ত্রিবেণীতে জাফর খাঁ গাজী এক বা একাধিক কারুকার্য খচিত হিন্দু মন্দির ভেঙে তার উপকরণ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করেন । পরবর্তীতেও এ ধারা অব্যাহত ছিলো। তারা বলেন, এ কারণেই বড় বড় হিন্দু মন্দির পরবর্তীতে বাংলায় গড়ে উঠতে পারেনি (মজুমদার, ১৯৯২,পৃ. ৪৪৫)।

মুসলমানগণ এদেশে এসে প্রথমত এদেশবাসীকে আপন করে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। এদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মধুর ব্যবহারের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানিয়েছে। এ সময় থেকেই অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। বখতিয়ার খলজি যখন বাংলায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন তখন নিম্নবর্ণসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন। এ সময় বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের ইবাদতগৃহ মসজিদ নির্মিত হতে থাকলে প্রতিবেশী হিন্দু এবং নওমুসলিমগণ মসজিদ নির্মাণে আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন। এ কথা অবাস্তব নয় যে, তারাই পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির থেকে পাথরখণ্ড সমসাময়িক নির্মাণাধীন মসজিদে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির দৃষ্টান্তস্বরূপ দান করেছিলেন। মুসলমানগণ তাদের এই দানের স্বীকৃতি দানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পাথর খণ্ডগুলো উদারভাবে মসজিদে সংস্থাপন করেছেন। উল্লেখ করা যায়, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও

সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসেবেই মুসলমানগণ মসজিদে হিন্দুদের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ব্যবহার করেছেন। ধর্মীয় আগ্রাসন বা জবরদখল করে মন্দির কেন মুসলমানগণ চাইলে সে সময়ে হিন্দুদের সে সব স্থান থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা রাখতেন। সুতরাং মন্দিরের পাথরের ভাঙা টুকরা গ্রহণের জন্য মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের মন্দির আক্রমণের প্রয়োজন হবে এ কথা কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া, এ ধরনের মন্দির আক্রমণের কোনো ঘটনা সমসাময়িক কোনো সাহিত্য বা কোনো সূত্রেও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মুসলিম বিজয়কালীন বাংলার সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে বৈচিত্র্যময়। সেন আমলে ধ্বংসের মুখোমুখি হলেও মুসলমান বিজয়ের ফলে বাংলার বহু ধর্ম, মত ও সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি গতিপ্রবাহ লাভ করে (Karim, 1959, p.18)। সম্পদে পরিপূর্ণ এই অঞ্চলটি শুধুমাত্র সঠিক দিক নির্দেশনা ও পরিচালনার অভাবে সর্বোপরি আদর্শের দেওলিয়াত্বের সম্মুখীন হয়েছিলো। অনৈতিকতা, অবাধ যৌনতা, অশ্লীলতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, বাংলার সমাজকে কলুষিত করে রেখেছিলো। উচ্চশ্রেণির লালসা ও স্বেচ্ছাচারিতায় নিম্নশ্রেণি ছিলো অসহায়। একচেটিয়া অধিকার শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণিরই ছিলো বলে ধরে নেয়া হতো। সমাজের সাধারণ মানুষ মুক্তির পথ খুঁজছিলো। একটু সম্মানের জন্য তারা ছিলো বড়ই উন্মুখ। এই প্রেক্ষাপটে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয় তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্য নির্দেশিকা

আজরফ, দেওয়ান মোহাম্মদ. (১৯৯৫). *সিলেটে ইসলাম*. ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আলী, এ.কে.এম. ইয়াকুব. (২০০২). *বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য*. ঢাকা: সময় প্রকাশন।

আলী, এ কে এম ইয়াকুব (২০০৮). *রাজশাহীতে ইসলাম*, ঢাকা: তাম্রলিপি।

আলী, একেএম. *ইয়াকুব. (*২০০৭). Education for Muslims under the Bengal Sultanate. একেএম শাহনাওয়াজ, ও ড. রুহুল কুদ্দুস মোঃ সালেহ (সম্পাদিত), *বরেন্দ্র বরেণ্য অধ্যাপক এ কে এম ইয়াকুব আলী সংবর্ধনা গ্রন্থ* (পৃ. ৭২৯-৭৪৩), ঢাকা: সময় প্রকাশন।

আহমদ, এ.কে.এম. নাজির. (১৯৯৯). *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

ইসলাম, নজরুল (১৪০২). *বাংলায় হিন্দু মুসলমান* সম্পর্ক, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.।

ওদুদ, কাজী আব্দুল. (১৯৯০). বাংলার মুসলমানদের কথা, মুস্তফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত). *বাংলাদেশ: বাঙালীর আত্মপরিচয়ের সন্ধানে*। ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স।

করিম, আব্দুল. (১৯৯১). *বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী*, *সফর আলী আকন্দ (সম্পাদিত). বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়*, রাজশাহী: ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ।

করিম, আব্দুল. (১৯৯৯). *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*. ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন ।

করিম, মো. আব্দুল. (২০০৮). *বাংলার প্রশাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস*, *মুসলিম আমল (১২০৫-১৭৫৭ খ্রি.)*. ঢাকা: সূচীপত্র।

খান, এম আবিদ আলী. (২০০৯). দ্বিতীয় সংস্করণ, *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতিকথা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

জলিল, মুহম্মদ আবদুল. (১৯৯৬). *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ*. ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

জয়ানন্দ. (১৩১২). *চৈতন্যমঙ্গল*, নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাগ (সম্পাদিত) কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

তালিব, আব্দুল মান্নান. (১৯৮০). *বাংলাদেশে ইসলাম*. ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী।

পণ্ডিত, রামাই. (১৩১৪). *শূণ্য পূরাণ*, এম.এন. বসু (সম্পাদিত), কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পাদিত). (১৯৮০). *বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*, কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশনী।

বিজয়গুপ্ত. (১৯৪৩). *মনসা মঙ্গল*. কলকাতা: বাণী নিকেতন ।

মুখোপাধ্যায়, সুখময়. (২০০০). *বাংলার ইতিহাস* (১২০৪-১৫৭৬), ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র. (১৯৯২), *বাংলাদেশের ইতিহাস* : প্রাচীন যুগ, (১ম খণ্ড). কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

মজুমদার, অতীন্দ্র. (১৯৯৫). *চর্যাপদ*. কলিকাতা: নয়া প্রকাশ।

মণ্ডল, সুশীলা. (n.d.). *বঙ্গদেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ*, ১ম পর্ব, কলিকাতা: প্রকাশ মন্দির প্রা. লি.।

রায়, নীহাররঞ্জন. (১৪০২). *বাঙালীর ইতিহাস* আদি পর্ব (দ্বিতীয় সংস্করণ). কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

রহিম, এম. এ. (১৯৮২). *বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস*, (১২০৩-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ). মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

শাহনাওয়াজ, এ.কে.এম. (১৯৯৯). *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী

শাহনাওয়াজ,এ.কে.এম. (২০০৮). সাম্প্রতিক প্রত্ন গবেষণায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের সম্ভাবনা. ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

শরীফ, আহমদ. (১৯৭৮). *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, (১ম খণ্ড), ঢাকা: বর্ণমিছিল।

সেন, দীনেশচন্দ. (১৯৯১). *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড (অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত). কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

সিরাজ, মিনহাজ-ই. (১৯৮৩). *তবকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনূদিত ও সম্পাদিত). ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

সিরাজ, মীনহাজ-ই. (২০০৭), *তবকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনূদিত ও সম্পাদিত). ঢাকা: দিব্য প্রকাশ।

হাকিম, খান বাহাদুর আব্দুল (সম্পাদিত). (১৯৭৬). *বাংলা বিশ্বকোষ*, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীন বুক হাউস লিমিটেড।

হক, মুহম্মদ এনামুল, লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন ও সরকার, স্বরোচিষ (সম্পাদিত). (২০০৫). *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

Ahmad, Shamsuddin. (1960). *Inscriptiption of Bengal*, Vol. IV, Rajshahi: Varendra Research Museum.

Ali, A. K. M. Yaqub. (1985). Education for Muslims under Bengal Sultanate, *Islamic Studies,* XXIV(4), Islamabad: Islamic Research Institute.

Eaton, R.M. (1996). *The rise of Islam and the Bengal frontier, 1204-1276*. Berkely and Los Angels, CA: University of California Press.

Gilmartin, David and Lawrence (2000). In Bruce B. (Eds.) *Beyond Turk and Hindu: Rethinking religious identities in Islamicate South Asia*. Gainsville, FL: University Press of Florida.

Gupta, P.L. (1976). The date of Bakhtiyar Khalji's occupation of Gaur. *Journal of the Varendra Research Museum,* Vol. IV. (1975-76). Rajsahi: *Varendra Research Museum, Rajsahi.*

Habib, Irfan. *Medieval India: study of civilization*. New Delhi: National Book Trust, 2008.

Jadunath, S. (2006). *The history of Bengal,* Muslim period 1200-1757, Vol-II, First Edition, Dhaka: University of Dhaka.

Karim, Abdul. (1959). *Social history of the Muslims in Bengal.* Dacca: The Asiatic Society of Pakistan.

Karim, Abdul. (1992). *Corpus of the Arabic and Persian inscriptions of Bengal,* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Mallick, A. R. (1965). *British policy and the Muslims in Bengal,* Dhaka.

Shahidullah, (n.d.) The influence of Urdu-Hindi on Bengali language and literature. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*. 7th Part, 1st Chapter.

Shahidullah, M. (1966). *Buddhist Mystic Songs*. Dacca: Bangla Academy.

Sircar, D. C. *Studies in the religious life of Ancient and Medieval India*. Delhi: Motilal Banarasidas, 1971.